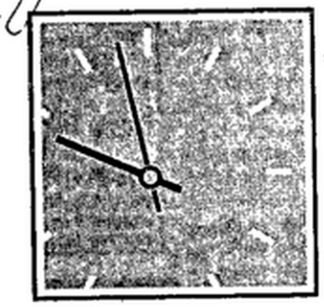

সহিষ্ণু সময়

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ হামিদা আলী

ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ হামিদা আলীর কার্যকাল বৃদ্ধির জন্য গভর্নিং বডির সর্বসম্মত প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ-- ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-- অগ্রাহ্য করেছে। এ খবরে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে এতই তীব্র ও ব্যাপক যে এ জন্য কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি ব্যাখ্যা দিতে। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ যা করেছে তা প্রচলিত বিধিবিধানসম্মত। সাধারণত একদল শিক্ষকের-তিনি অধ্যক্ষও হতে পারেন-- অবসর গ্রহণ ৬০ বৎসর বয়সে। তবে তারপরও কর্তৃপক্ষ পারে আরও ৫ (২+২+১) বৎসর দায়িত্ব পালনের মেয়াদ বাড়াতে। হামিদা আলীর বেলায়ও তাই করা হয়েছে। ৬৫ বৎসর পূর্তির পর আর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি হয় না।

কর্তৃপক্ষ- শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি এটুকু বলেই থেমে যেত, সেটা শোভন হতো। কিন্তু না, একই 'তথ্য বিবরণী'তে অধ্যক্ষ হামিদা আলীর বিরুদ্ধে ৭টি অনিয়মের অভিযোগ এনেছে। অর্থাৎ তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয়তার গোড়া কেটে দেওয়ার একটা হীন প্রচেষ্টা করা হয়েছে। আর এ জন্যই আমার মনে ক'টি প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। একটু পরেই সে প্রসঙ্গে আসছি।

ভিকারুননিসা ও হামিদা আলী একটি অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে বেশ কিছু দিন থেকেই। সর্বসাধারণ জানে, ভিকারুননিসার বর্তমান রূপ। বর্তমান খ্যাতি-এসব কিছুর মূলেই আছেন এই অসাধারণ কর্মপটু মহিলা। শুধু তাঁর ছাত্রীদের মধ্যেই নয়, অভিভাবকদের মধ্যেও তিনি যে আস্থা ও ভালবাসার জায়গা করে নিয়েছেন, তা তুলনাহীন। তিনি আর অধ্যক্ষ থাকছেন না, এ খবরে কান্নার রোল পড়েছে ছাত্রীদের মধ্যে, তবে শুধু কান্না নয়, তারা শ'য়ে শ'য়ে রাস্তায় নেমেছে ও সারাদিন অবস্থান নিয়েছে রাজপথে। এর আগে কোন দিন এই স্কুলের মেয়েরা এ কাজ করেনি। করার প্রয়োজন হয়নি। অভিভাবকেরা, শুভানুধ্যায়ীরা, প্রাক্তন ছাত্রীরা ছুটে এসেছেন হামিদা আলীর স্কুলে, তাঁদের সমর্থন জানাতে, তাঁর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করতে। এর সঙ্গে তুলনীয় কোন স্বতঃস্ফূর্ত বেদনা বিশ্ময় মিশ্রিত প্রতিবাদ আমার জানা নেই। এক দিকে আইন, অন্যদিকে আবেগ, এ দুটির চাহিদা মেটানো কি একেবারেই অসম্ভব? শুধু বায়বীয় আবেগ হলে কথা ছিল না, এ আবেগের ভিত্তি কতো দৃঢ়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কর্তৃপক্ষ বলছে, এটা অপসারণ নয়, আইনসিদ্ধ অবসর গ্রহণ। অধ্যক্ষ হামিদা আলী প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তাঁর আসন আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁকে যেতে হবে।

ছাত্রী-অভিভাবকেরা বলছে, যেতে নাহি দিব। তারা খামোখা এ কথা বলছেন না। কারণ ভিকারুননিসার প্রকৃত অভিভাবক, গভর্নিং বডিও সমস্বরে এ কথাই বলেছে। প্রতিবাদীদের নৈতিক জোরটা এখানেই। গভর্নিং বডির সভাপতি। যিনি একজন সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, তিনিও তাঁর একাত্মতা প্রকাশ করেছেন সবার সঙ্গে। তিনি দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে, এতে কোন কাজ হয়নি। কিভাবে যেন মনে হচ্ছে, পুরো ঘটনাটা একটি রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করেছে। কারণ ভিকারুননিসার এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অবস্থিত উদয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর অপসারণ সম্পর্কিত সংবাদ। দ্বিতীয় ঘটনাটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ এটি স্পষ্টতই দলীয়করণের পর্যায়ে পড়ে। যে বিবেচনায় বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে পদচ্যুত করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানকে দলীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে, মনে হয় সেই একই বিবেচনা কাজ করেছে উদয়ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার ক্ষেত্রে। হামিদা আলীর বেলায় আইনের দোহাই দেয়া হয়েছে। শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর বেলায় কিসের দোহাই দেয়া হয়েছে, বা হবে, আমি জানি না।

ভিকারুননিসার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন করা যায়। এটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে যাঁরা আছেন, তাঁরা চাকুরীর মেয়াদ সংক্রান্ত প্রচলিত বিধিবিধান জানেন না, তা হতে পারে না। তাহলে কথা হচ্ছে, জেনেও তাঁরা যে হামিদা আলীর কার্যকাল বাড়িয়ে দেয়ার সর্বসম্মত প্রস্তাব করলেন, সেটা কিসের জোরে? তাঁরা নিশ্চয়ই এ বিশ্বাসে এটা করেছেন যে গভর্নিং বডির সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত সরকার মেনে নেবে এবং এ জন্য প্রচলিত বিধিবিধান কোন বাধা হবে না। জানি না, এ ধরনের কোন দৃষ্টান্ত আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে তাদের সুপারিশের জোর বাড়ে। যদি না থাকে, তাহলেও দৃষ্টান্ত স্থাপনের পক্ষে জোরাল যুক্তি আছে। দৃষ্টান্ত স্থাপনের পক্ষে কী কী যুক্তি দাঁড় করানো যায়?

এক : দেশের একটি অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠানকে তার স্বাভাবিক জীবনে স্থিত থাকার স্বার্থে, তাকে অক্ষত-অনাহত রাখার স্বার্থে, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ পরিচয়ে যাঁকে সারা দেশ জানে, তাঁকে, তাঁর এতদিনকার কৃতির সামান্য স্বীকৃতি হিসাবে, তাঁর অক্ষুণ্ন কর্মক্ষমতার কথা বিবেচনা করে, তাঁর অগণিত ছাত্রী, অভিভাবক মণ্ডলি ও গভর্নিং বডির ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে, প্রচলিত আইনের শর্তকে শিথিল করে, হামিদা আলীর কার্যকাল বৃদ্ধি করা সঙ্গত। এতে আইনের লঙ্ঘন হবে না, বরং এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ আইন তৈরী করে মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে, এ ক্ষেত্রে আইন শিথিল করে কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠানেরই মঙ্গল করা হবে, ব্যক্তি হামিদা আলীর নয়।

দুই : দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, এক কথায় সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে ধস নেমেছে, যে অরাজকতা অনিয়ম অযোগ্যতা ব্যর্থতা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে গুটিকয়, আঙ্গুলে গোনা যায় সংখ্যায় এত কম, প্রতিষ্ঠান এখনও রক্ষা করে চলেছে শিক্ষার আদর্শ, নিজেদের রক্ষা করেছে পরিপার্শ্বের ব্যাপক কলুষতা থেকে এবং যা সম্ভব হয়েছে একজন নিবেদিতপ্রাণ বিক্ষুব্রেতীর অমূল্য নেতৃত্বের কারণে, যার অবর্তমানে বহু বৎসরের অর্জন দু'দিনে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাঁকে স্বপদে স্থির রেখে প্রতিষ্ঠানটিকেও রক্ষা করা, অনিবার্য পতন থেকে রক্ষা করা, সরকারের কর্তব্য। চিন্তা করে দেখা যেতে পারে বারডেম ও তার প্রাণ-পুরুষ ডা. মোহাম্মদ ইবরাহিমের কথা। যদি বয়সের অজুহাত দেখিয়ে ডা. মোহাম্মদ ইবরাহিমকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হতো ৬৫ বৎসরে, তাহলে তার পরও ষোল বৎসরে ডা. ইবরাহিম যা করেছেন বারডেমের জন্য, সেটা কি সম্ভব হতো? বারডেম, যতোদূর জানি, অব্যাহতভাবে সরকারের আর্থিক ও অন্যরূপ সমর্থন পেয়েছে। তুলনায় ভিকারুননিসা অনেকটাই স্বনির্ভর। দুটি প্রতিষ্ঠানই পূর্ণতা লাভ করেছে এক ব্যক্তির সঙ্কল্প ও সাধনায়। কোন সরকার কি একবারও ভাবতে পেরেছিল, ৬৫ পেরিয়ে যাওয়া ডা. ইবরাহিমকে অব্যাহতি দেয়া হোক। তাঁর অবসর প্রাপ্য হয়েছে? বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সরকারের প্রস্তাবিত বিধিবিধান বয়সের প্রশ্নে (৭০ বৎসর) যে নমনীয়তা দেখিয়েছে, বেসরকারী স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রে কেন তা হবে না? অবসর গ্রহণের পরও তা সরকার সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে অনবরত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে চলেছে সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের। কেন দিয়েছে? নিশ্চয়ই ব্যক্তি স্বার্থে নয়। প্রশাসনের স্বার্থে।

তিন : অধ্যক্ষ হামিদা আলীও অবশ্যই একদিন-না-একদিন অবসর গ্রহণ করবেন। তবে এ মুহূর্তে ভিকারুননিসার অব্যাহত ও ঈর্ষণীয় অগ্রগতি দাবি করে তাঁর কল্যাণময় উপস্থিতি। যতো আইনের দোহাই-ই পাড়ুক কর্তৃপক্ষ-শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সাধারণ মানুষ সরকারের এই হস্তক্ষেপকে একটি নিঃস্বার্থ ও নির্মল সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখবে না। যে-দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে অসময়ে অপসৃত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অপসারণকে, সেই একই দৃষ্টিতে দেখা হবে ভিকারুননিসার অধ্যক্ষের অপসারণকে। অর্থাৎ এটি অপসারণই গণ্য হবে, 'অবসরগ্রহণ' নয়। অন্যান্য অপসারণের ধারাবাহিকতায়। এবং এটি আরও নিন্দিত হবে, এ জন্য যে রাজনীতিদুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় ভিকারুননিসা একটি রাজনীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বহুদিন যাবৎ রাজনীতির আঘাত-প্রত্যাঘাতের ভিতর দিয়ে চলেছে। তাদের থেকে ভিকারুননিসার অবস্থান ভিন্ন। এর উপর যে কোন আঘাত যদি মানুষ রাজনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করে, তাহলে সেটা সরকারের জন্য শুভ হবে না। হস্তক্ষেপের হাত গুটিয়ে সরকার এ সন্দেহের নিরসন করতে পারে।

চার : বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারী প্রতিষ্ঠানের যে-মৌলিক পার্থক্য, সেটা প্রায়শঃই ভুলে গিয়েছে দেশের সরকারগুলি। কোন উন্নত দেশেই সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য বিধিবিধান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্বিচারে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বড়ো শক্তি, এর স্বকীয়তা, কোনটিই অন্যটির হুবহু সংস্করণ নয়। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, প্রত্যেকটি গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে নিজের প্রাণশক্তিতে। তুলনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক আইনের নিগড়ে বাঁধা। এ জন্য এগুলি প্রায়শঃই প্রাণহীনতার শিকার, কারণ এখানে সৃষ্টিশীল চিন্তার ও কর্মের সুযোগ অত্যন্ত কম। এখন সারা বিশ্বে বেসরকারী উদ্যোগের জয়জয়কার। সরকারকে অনুধাবন করতে হবে, ভিকারুননিসা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বলেই তার বর্তমান অবস্থানে আসতে পেরেছে। এর স্বতন্ত্র, এর বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হবে চরম দীনতা, হয়তো চরম মূঢ়তা।

পুনশ্চ : এই লেখাটির রচনা-১৫/৭/০২-ও প্রকাশনার ১৯/৭/০২-এর মধ্যে যদি সরকার শুভবুদ্ধির প্রণোদনায় সিদ্ধান্ত বদলায়, তাহলেও আশা করি লেখাটির প্রাসঙ্গিকতা নষ্ট হবে না। (জি-র-সি)

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
19 2002